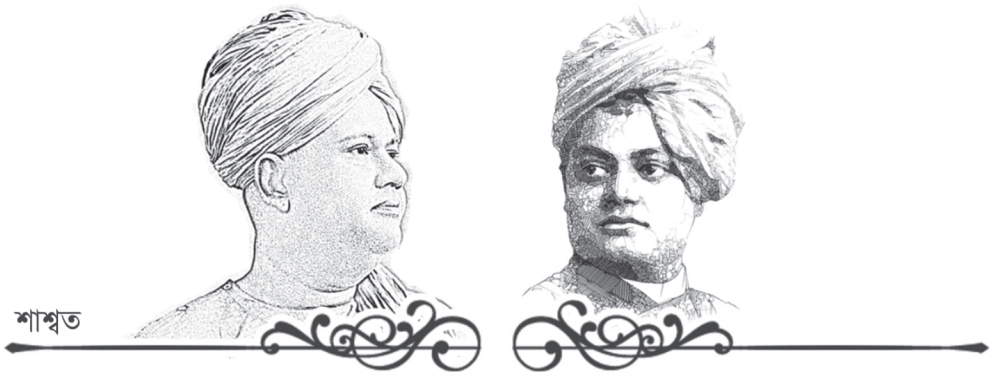

শাশ্বত

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ প্রসঙ্গে

স্বামী সুহিতানন্দ

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের বেশ কয়েকটি আন্দোলন দেখে যেতে পেরেছিলেন। তিনি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ আন্দোলন আরম্ভ করে গিয়েছেন বেলুড় মঠে; গান্ধিজী আন্দোলন করছেন ওয়ার্ধাতে, শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরিতে, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং শান্তিনিকেতনে। তাঁর পর্যালোচনা ছিল : তাঁরা জোর দিচ্ছেন পরিকল্পনার উপর; কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ গুরুত্ব দিয়েছেন অন্য দুটি বিষয়ে। প্রথমত, চিন্তা অর্থাৎ তত্ত্বের উপর—তাঁর স্বল্পকালীন জীবনের মধ্যেই তিনি ঢেলে দিয়েছেন যাবতীয় তত্ত্ব; এবং দ্বিতীয়ত, সম্প্রদায়ের উপর অর্থাৎ পরবর্তী প্রজন্ম কীভাবে গড়ে উঠবে তার উপর। রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক, তাই ভবিষ্যতের ইঙ্গিত তিনি ধরতে পেরেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন, বিবেকানন্দের প্রকল্প স্থিরগতিতে এগিয়ে চলেছে, আপেক্ষিকভাবে তাঁদের প্রকল্পগুলি যেন শ্লথ। এই প্রেক্ষিতে বলা চলে, রামকৃষ্ণ মিশন তার সূচনাপর্ব থেকেই অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় ধীর অথচ সবল পদক্ষেপ নিচ্ছে।

প্রথমটির বিষয়ে বলতে পারি, আমাদের সঙ্ঘে একটি অপূর্ব জিনিস আছে : ভাবসংশুদ্ধি। আমি যাই বলি বা করি না কেন, যে-পরিকল্পনাই গ্রহণ করি না কেন, তার ন্যায্যতা আমায় বিচার করতে হবে আমাদের সঙ্ঘের রেকর্ড দিয়ে। দেখতে হবে সেটির 'ঐতিহাসিক সততা' আছে কী না। তার আলোকেই আমার কাজ বা আচরণটিকে আমায় উপস্থাপিত করতে হবে। এত বড় একটা জিনিস স্বামীজী আমাদের দিয়ে গেছেন।

এবার দ্বিতীয়টি। স্বামীজী চেয়েছিলেন 'choicest, best and purest' ছেলেরা সঙ্ঘে আসবে। শ্রীশ্রীঠাকুর, মা, স্বামীজী, রাজা মহারাজের আহ্বানে সেই সোনার টুকরো ছেলেরা আসছে। নিজেদের জীবন, নিজেদের চরিত্র দিয়ে তারা সঙ্ঘকে তৈরি করে নিয়েছে, নিচ্ছে। আমাদের সঙ্ঘে যোগদান করতে হলে তিনটি জিনিস ত্যাগ করা চাই-ই চাই—কামিনী, কাঞ্চন এবং personal ambition। প্রথমটির জন্য প্রয়োজন নারীজাতিতে মাতৃবুদ্ধি। দ্বিতীয়, তোমার কোনও ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে না। তাহলে তোমার কোনও individual existence থাকল না। তৃতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ,

অন্যতম সহ সঙ্ঘাধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন

কোনও ব্যক্তিগত উচ্চাশা থাকবে না। এই তিনটি করতে পারলে তবেই তুমি আমাদের সঙ্ঘে স্থান পাবে। তা, এইরকম ছেলেরাই সঙ্ঘে আসে। তাদের জন্যই আজ সঙ্ঘের এই ব্যাপ্তি, তাদের জন্যই আজ সঙ্ঘ একটি positive force-এ পরিণত হয়েছে। আমরা, সারদা মঠ, ভাবপ্রচার পরিষদ, যুবমহামণ্ডল, আমাদের দীক্ষিত ভক্ত, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে দেশেবিদেশের ভক্ত, সাধক—সকলেই নিজেদের জীবন দিয়ে এই ভাবটিকে পরিপুষ্ট করে রেখেছি। রোমাঁ্যা রোল্যাঁ আমাদের বলেছেন 'creative minority'—সংখ্যায় সামান্য কিন্তু creative—সচল, সচঞ্চল এবং সজীব শক্তি।

কথামৃত রেকর্ড করেছেন মাস্টারমশাই। তিনি দেখেছেন এক ভাবে-পাগল মানুষকে—আর সেই মানুষটির আচার-আচরণ তিনি যেভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন তা বিস্ময়কর! কথামৃত পড়তে গেলে দুটি জিনিস দেখতে হয়—মাস্টারমশাইয়ের ভূমিকা আর শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকা। প্রথমটি কীরকম? আমরা যখন মাইকের সামনে কথা বলি তখন কথাটা উচ্চস্বরে হয়ে যায়। এতে মাইকের কোনও দায়দায়িত্ব নেই। শ্রীম-র ব্যাপারটাও ঠিক তেমনই। তিনি যেন ভিডিও করে নিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণের কথা, আচরণ। আবার পরে যখন সেটা বইয়ের ভাষায় লিপিবদ্ধ করতে গেছেন, তার আগে তপস্যা করেছেন, হোমওয়ার্ক করেছেন, ধ্যান করে করে নিজের মনকে সেই কসমিক প্লেনে—কারণশরীরে নিয়ে গেছেন যে-স্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ থাকতেন, তারপর তাঁর কথাগুলি হুবহু নকল করেছেন। শ্রীম-র একটি দৈবী শক্তি ছিল, সেই শক্তিবলে তিনি সংগ্রাহক মাত্র। মাইক আমাদের কথা কিছু না বুঝেই উচ্চস্বর করে দেয়; শ্রীমও যদি বুঝে বুঝে সব করতেন তাহলে এত নিখুঁত হত না। তিনি যেন যন্ত্রমাত্র, রেকর্ড করবার জন্যই এসেছিলেন।

আর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখি, এই তিনি ভাবস্থ হচ্ছেন, এই সমাধিস্থ হচ্ছেন, নাচছেন-গাইছেন—কোথাও তাঁর জন্য স্টেজ প্রিপারেশন দরকার হয়নি। তিনি নিজে থেকেই স্টেজ তৈরি করে নিয়েছেন। কারণ তিনি ঈশ্বর। ঈশ্বর যা করেন সেটাই লীলা, জগতকে সেটাই গ্রহণ করতে হয়। ঠাকুর সব জায়গায় গিয়ে কথা বলছেন, নাচগান করছেন—কী নিঃসংকোচে নিরায়াসে সর্বত্র যাচ্ছেন—ঠিক শিশুর মতো! আর যখন কথা বলছেন, আমরা দেখে চমকে যাই। তাঁর কথার মধ্যে এই বৃহদারণ্যক, এই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, এই পাতঞ্জল যোগসূত্র, এই সাংখ্য দর্শন, এই ভাগবত, এই চৈতন্যচরিতামৃত—সমস্ত রয়েছে! পাতার পর পাতা গভীর তত্ত্বে ঠাসা। এমনকী আউল, বাউল—কী নেই! সবাইকে নিয়ে আছেন। বাজিকররা যেমন চার-পাঁচটা বল নিয়ে খেলা করে, তিনিও তেমনই অধ্যাত্মরাজ্যে খেলা করছেন ওইসব নিয়ে। শুধু খেলাই নয়। চৈতন্যদেবের অতীন্দ্রিয় ভাবটি চরিতামৃতকার লক্ষণার দ্বারা একটু ধরতে পেরেছেন। কিন্তু কথামৃতে আমরা পাচ্ছি, চৈতন্যদেবের অন্তরে কী কী অনুভব হত সেই সমস্ত ব্যাপার, কারণশরীরে মন থাকলে কী কী হতে পারে সেই সব কথা—ঠাকুরের ব্যাখ্যায় এবং আচরণে।

ঠাকুর, মা, স্বামীজী, রাজা মহারাজ—এঁরা এসেছেন আমাদের মনকে উচ্চস্তরে তুলে নেওয়ার জন্য। একটা ছোট্ট ঘটনা। রাজা মহারাজ একদিন মায়ের কাছে গেছেন, চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠাকুরের ছবির দিকে তাকাচ্ছেন। তখন তিনি সঙ্ঘগুরু, বছর পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশ বয়স হবে। তারপর শিশুর মতো মাকে বলছেন, ''মা, আমার না ওই মালাটা পরার ইচ্ছা।'' ঠাকুরের গলায় মালা রয়েছে, ওই মালাটি তাঁর পরতে ইচ্ছা হয়েছে। মা বললেন, ''বেশ তো, পরো না বাবা!'' তখন রাজা

মহারাজ গোলাপ মাকে দেখিয়ে বলছেন, ''না না, ও বকবে আমাকে!'' ভাবা যায়! সঙ্ঘগুরু—চার-পাঁচ বছরের শিশুর মতো হয়ে গেছেন! এইসব মধুর ঘটনা আমাদের মনকে কোথায় নিয়ে যায়!

মহারাজ একটু আয়েশী ছিলেন। ঠাকুরের আদরের ছেলে। তিনি নিজেও কখনও কখনও চিঠিতে লিখেছেন, ''তোরা তো জানিস আমি এরকমই, একটু এলোমেলো—আমাকে ক্ষমাঘেন্না করে নিস'' ইত্যাদি। সেই মহারাজকে একবার জোর করে এঁরা উপবাস করিয়েছেন—শিবরাত্রি বা ওইরকম কোনওদিনে। শশী মহারাজ সেটা উৎসাহের সঙ্গে স্বামীজীকে লিখেছেন। স্বামীজী লিখলেন, ''না, তোমরা ঠিক করনি। রাজা হল ঠাকুরের আদরের ধন। ওকে যত্ন করতে হবে।''

ঠাকুর বলেছিলেন, রাখালের রাজবুদ্ধি আছে। শ্যামপুকুরে যখন তাঁর রোগের বৃদ্ধি হল, আর একটু বৃহৎ পরিসরে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার কথা হল, তখন ঠাকুর চেয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যেতে, কারণ কলকাতায় বাড়িভাড়া প্রচুর। তিনি রাখালকে দিয়ে একটি চিঠি ত্রৈলোক্যের কাছে পাঠালেন। রাখালকে দারোয়ানরা তো তাড়িয়েই দিচ্ছে! রাখালের রাজবুদ্ধি—তিনি কোনওমতে একজন দারোয়ানের মাধ্যমে চিঠিটি পৌঁছনোর ব্যবস্থা করলেন।

রাজা মহারাজ ঠাকুরের কাছে যাওয়ার আগেই ঠাকুর ভাবনেত্রে দর্শন করেছিলেন, তাঁর কোলে একটি বালককে মা জগদম্বা বসিয়ে দিলেন। সেই বালকই রাখাল। লীলার জন্যই রাজা মহারাজের অবতরণ। গীতায় যেমন শ্রীভগবান বলেছেন মহর্ষি, মনু প্রভৃতি তাঁর 'মানসা জাতাঃ'—সংকল্পজাত, তেমনই এসব দৈবী লীলাও ভগবানের মানসজাত। স্বামীজী, রাজা মহারাজ, মাস্টারমশাই, বলরামবাবু, গিরিশবাবু—সকলকেই ঠাকুর দেখে নিয়েছিলেন বাস্তবে তাঁরা তাঁর কাছে যাওয়ার আগেই। সে-দর্শন হত সূক্ষ্মশরীরে বা কারণশরীরে।

এমন বহু ঘটনা জানা যায়। মিস ওয়াল্ডো স্বামীজীর সঙ্গ লাভ করেছিলেন, তাঁর স্টেনোগ্রাফার ছিলেন। মিস ম্যাকলাউড ভারতে আসার পর শ্রীশ্রীমায়ের ছবি তুলে নিয়ে যান। বিদেশে ফিরে তিনি সেই ছবির একটি কপি মিস ওয়াল্ডোকে দিলে ওয়াল্ডো ছবি দেখেই বলেন, ''আমি তো এভাবেই এঁকে দর্শন করেছি।'' এ-ও 'মানসা জাতাঃ'।

শ্রীশ্রীমা একদিন নিবেদিতাকে বলেন, তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরে একদিন বলেছিলেন, তাঁর সাদা সাদা ভক্তদের কাছে তিনি গিয়েছিলেন। কৌতূহলী নিবেদিতা সময়টি জানতে চাইলেন। মা জানালেন, অমুক বছর, রথযাত্রার দিন। নিবেদিতা তাঁর ডায়েরি দেখে বললেন, ওইসময় তিনি এক 'mystic'কে স্বপ্নে দর্শন করেছিলেন। কোথায় কাশীপুর কোথায় আয়ারল্যান্ড! 'মানসা জাতাঃ'।

অভয়ানন্দজী মায়ের দীক্ষিত সন্তান। মায়ের তখন শেষ অসুখ চলছে। মহারাজ পাহাড়ে থাকেন, একদিন স্বপ্ন দেখলেন মা রাজরাজেশ্বরী বেশে একটি মন্দিরে বসে আছেন—অনেকটা বেলুড় মঠের এখনকার মায়ের মন্দিরের মতন। তারপর সংবাদ পেলেন সেইরাত্রে মা দেহত্যাগ করেছেন। অথচ তখনও মায়ের মন্দির গড়ে ওঠেনি।

অপূর্বানন্দ মহারাজ দীক্ষাপ্রার্থী হয়ে উদ্বোধনে এসেছেন। দুদিন মায়ের দর্শনই হল না—তৃতীয় দিন ব্যাকুল হয়ে কাঁদছেন—হঠাৎ এক দেবীমূর্তির দর্শন পেলেন। মন খুব শান্ত হল। যথাসময়ে মাকে দর্শন করতে এলেন—সেই প্রথম দর্শন। এ কী—এ তো সেই দেবীমূর্তি! এসবই 'মানসা জাতাঃ' নয় কি?

স্বামীজী, রাজা মহারাজ—এঁরা ঈশ্বরকোটি। ঈশ্বরকোটিরই শক্তি থাকে মানুষের কর্মফল পরিবর্তিত করার। আমরা তাঁদের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করি—তাঁরা আমাদের কৃপা করুন, তাঁদের দিকে যেন আমরা মন রাখতে পারি।